একুশ তুমি কোথায় !

মোজাম্মেল হোসেন(ত্বোহা)

একঃ

২০০৪ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি । আসন্ন এস.এস.সি পরীক্ষা নিয়ে রীতিমত ব্যস্ত আমি। পীথাগোরাসের উপপাদ্যটা আরেকবার করব কি করব না ভাবছিলাম, এমন সময় আমার ছোটভাই তালহা এসে বলল, ‘ভাইয়া, চল।’ আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোথায়?’ ‘কেন, স্কুলে! নামিয়ে দিয়ে আসবে না আমাদের?’ ‘আজ আবার স্কুল কিসের? আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারি না? ভাগ এখান থেকে!’

ক্লাস ওয়ানের ছাত্র তালহা আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। বুঝলাম, ২১ শে ফেব্রুয়ারি ব্যাপারটা তার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। ততক্ষণে আমার ছোট বোন তিথীও তালহার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পরনে স্কুল ড্রেস এবং কাঁধে স্কুলের ব্যাগ। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কিরে, আজ শহীদ দিবস - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তোদের স্কুল ছুটি দেয়নি?’

‘না তো!’
‘ছুটি দেয়নি? তাহলে কি কোন অনুষ্ঠান হবে?’
‘না, কিছুই তো বলেনি, কোন নোটিসও দেয়নি।’
‘এটা আবার কি ধরনের কথা? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান না হয় নাই করল, তাই বলে স্কুলও ছুটি দিবে না?’
‘আমাদের আবার স্কুল!’ মুখ বাঁকিয়ে বলল তিথী, ‘নুরু” সাহেবের কাছে এসব জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দিবসের মূল্যবোধের কোন মূল্য আছে? তার কাছে তো ...’

তিথী সম্ভবত আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কথা শেষ করার আগেই আম্মুর ডাকে তাকে চলে যেতে হল। আমি তালহার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘দশ মিনিট অপেক্ষা কর। আজকে একটু দেরী করেই যাব। নুরু সাহেবের সাথে কথা আছে আমার।’

তালহা ঘাড় কাত করে পাশের রুমে চলে গেল।

দুইঃ

আমাদের স্কুলটির নাম হল ‘সিরত বাংলাদেশী স্কুল।’ লিবিয়ার সিরত শহরে ভূ-মধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত এই স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন মোঃ নুরুন্নবী। তার নাম নুরুন্নবী হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত। তার মধ্যে উলেখযোগ্য হল নুরু সাহেব, বোম্বলি (সিলিন্ডার এর আরবী শব্দ), ডাউনলোড ইত্যাদি। মোট কয়জন ছাত্র তাকে পেছনে তার আসল নাম ধরে সম্বোধন করে, সেটা রীতিমত গবেষণার বিষয়।

এই নুরু সাহেব আমাদের স্কুলে প্রথম শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ১৯৯৯ সালে। তখন তিনি বেশ ভালোই ক্লাস

নিতেন। তিনি ছিলেন ইংরেজীর শিক্ষক। তিনি এতই মনোযোগ সহকারে ভয়েস এবং ন্যারেশান পড়াতেন যে, কখন লেইজার পিরিয়ড শুরু হয়ে আবার শেষ হয়েও যেত, তার খবর থাকত না। ছাত্রছাত্রীদেরকে ভয়েস বুঝাতে বুঝাতে একবার ন্যারেশানে চলে যেতেন আবার সেই ন্যারেশান বুঝাতে বুঝাতে ভয়েসে ফিরে আসতেন। ততক্ষণে লেইজারের পরের ক্লাসের টিচার এসে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত আর ওদিকে ছাত্রছাত্রীরা তদের টিফিন টাইম নষ্ট করার জন্য মনে মনে তার চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করত।

আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগেও, যখন লিবিয়াতে ডিশ এন্টেনার এত বেশি প্রচলন ছিল না এবং ইন্টারনেটের নামও মানুষের কাছে পরিচিত লাভ করেনি, তখন মাঝে মাঝে সৌভগ্যবশত যদি কারো কাছে বাংলা পত্রিকা দেখতাম, সেটাই দাঁড়ি-কমা সহ পড়ে ফেলতাম। সেসব পত্রিকা (অধিকাংশই সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক) পড়ে বা মাঝে মাঝে বাংলা সিনেমা দেখে যখন বাংলাদেশের অসৎ রাজনীতিবিদদের কথা জানতে পারতাম, তখন অবাক হয়ে ভাবতাম, একজন মানুষ এতটা অসৎ হয় কি করে! একজন মানুষ কি করে আরেকজন মানুষের অধিকার এভাবে খর্ব করতে পারে! কিভাবে জনগণের সাথে এতটা প্রতারণা করতে পারে! কিন্তু এখন আর এসব ভেবে অবাক হই না। এখন আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে এর জ্বলন্ত প্রমাণ। যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থের জন্য, সামান্য কটা টাকার জন্য শিক্ষার মত মৌলিক অধিকারকে এভাবে পদদলিত করতে পারে, তার পক্ষে পৃথিবীর জঘন্যতম অন্যায় কাজটি করা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র!

তিন.

তিথী এবং অলহককে নিয়ে আমি আজ বেশ দেরী করেই স্কুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমার ইচ্ছে ছিল, নুরু সাহেবের সাথে দেখা করে একুশে ফেব্রুয়ারিতেও স্কুল খোলা রাখার অৎপর্যটা জিজ্ঞেস করব। আমরা স্কুলে গিয়ে পৌঁছলাম চারটা পঁয়তালিশে। আমি আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করে ঘরে ফিরে গেলাম।

সেদিন রাতে স্কুল ছুটির সময় আবার স্কুলে গেলাম এবং সৌভাগ্যবশত নুরু সাহেবকেও স্কুলে পেয়ে গেলাম। তিনি তখন স্কুল প্রঙ্গণে রাখা তার গাড়ি থেকে নেমে মাত্র স্কুলে ঢুকছিলেন। কাছে গিয়ে কোন প্রকার ভনিতা না করে সরাসরি ছুটি না দেওয়ার কারণটা জানতে চাইলাম। উত্তরে আমাকে পাশ কাটিয়ে স্কুলে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, 'ও, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি নাকি? অসুবিধা নেই, এক বছর ছুটি না দিলে কি আর আসবে যাবে?' বিস্ময়ে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। কি অবলীলায় কথাগুলো বলে চলে গেল! কণ্ঠে বিন্দুমাত্র বিব্রত বোধটুকুও নেই!

স্কুলের ভেতর থেকে নার্সারী-কেজির ছাত্রছাত্রীদের চ্যাঁচামেচিতে সৃষ্ট আশি ডেসিবলের শব্দ তরঙ্গায়িত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ফেব্রুয়ারীর তীব্র ভূমধ্যসাগরীয় হিমেল হাওয়া দু'কানের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ করে চলে যাচ্ছে। স্কুলের অনতিদূরে ওয়টার পান্টের বিকট শব্দে বাতাস ভরী হয়ে যাচ্ছে। আসন্ন লিবিয়ার জাতীয় দিবস এসনাঈন মারেস (দোসরা মার্চ - মার্কিন বিতাড়ন দিবস) উদ্যাপন উপলক্ষে রাস্তায় টহলরত পুলিশের পেট্রোল কারের সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ কর্ণমূল ভেদ করে মস্তিষ্কে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু আমি সেসব কিছুই শুনতে পারছি না। আমার কানে শুধু একটা কথা বাজছে- 'এক বছর ছুটি না দিলে কি আর আসবে যাবে?'

চার.

লিবিয়ায় নিযুক্ত সারেক রাষ্ট্রদূত জনাব এফ. এম. গোলাম হোসেন সর্বমোট পাঁচবার আনুষ্ঠানিকভাবে সিরত বাংলাদেশী স্কুল সফর করেছিলেন। প্রতিবারই প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কিছু কমন বিষয় ছিল। এই

যেমন, পাঁচবারই তিনি বক্তৃতার মধ্যে দুটি করে গল্প বলেছিলেন। প্রতিবারই গল্পগুলো ছিল অভিন্ন।

তাঁর প্রথম গল্পটি ছিল মোটামুটি এরকম যে, তিনি যখন ম্যানচেস্টারে থাকতেন, তখন তঁকে কোন এক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদেরও দেখতে পেলেন। তাঁদের মধ্যে এক ভদ্রমহিলাও ছিলেন। তো, আমাদের রাষ্ট্রদূত মহাশয় দেখতে পেলেন যে, সেই ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ পরপরই তঁর ব্যাগের ভেতর থেকে কি যেন একটা কাগজ বের করে পড়ছিলেন। রাষ্ট্রদূত ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন যে, একটু পরে তাঁকে বক্তৃতা করতে হবে তো, তাই তার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা বক্তৃতা করতে গেলেন। কিন্তু বক্তৃতার শব্দগুলো তঁর মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে রীতিমত আপত্তি করছিল। তাঁর হাঁটুও শুরু করেছিল কাঁপাকাঁপি । হাঁটু কাঁপতে কাঁপতে তঁর পুরো শরীর এবং শেষ পর্যন্ত টেবিল পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। তাঁর এই দূরবস্থা দেখে গোলাম হোসেন সাহেবের আশঙ্কা হল যে, ভদ্রমহিলা হয়তো হার্ট অ্যাটাকই করে বসবেন। কাজেই তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভদ্রমহিলাকে ধরে জায়গামতো বসিয়ে দিলেন। গল্পটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য না হলেও প্রতিবারই আমরা তঁর এই গল্প শুনে অট্টহাসি হেসে উঠতাম এবং তুমুল করতালিতে ফেটে পড়তাম, যেহেতু তিনি ছিলেন আমাদের রাষ্ট্রদূত।

তাঁর দ্বিতীয় গল্প ছিল, তিনি যখন শারজাহে (ম্যানচেস্টারও হতে পারে; ঠিক মনে পড়ছে না) ছিলেন, তখন সেখানকার বাংলাদেশী কমিউনিটির এক অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রধান অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। সেই অনুষ্ঠান শেষে ক্লাস টেনের এক মেয়ে তঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, স্বাধীনতা জিনিসটা কি? অর্থাৎ, সেই কমিউনিটি বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিল যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে সেখানকার দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরও কোন ধারণা ছিল না।

রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের গল্পদুটো সত্যই হোক আর তাঁর বক্তব্য আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই হোক, সেটা আমাদের জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে, সিরত বাংলাদেশী স্কুলের অবস্থাও দিনে দিনে সেই বাংলাদেশী কমিউনিটির মত হয়ে যাচ্ছে। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে এই স্কুলে একবারও একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়নি। আর ২০০৪ সালে তো ছুটিও দেওয়া হল না। অথচ এক সময় এই স্কুলে কি আড়ম্বরের সাথেই না এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হত! ছাত্রছাত্রীরা কি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করত, জ্বালাময়ী কণ্ঠে বক্তব্য রাখত! এখন সিরত বাংলাদেশী স্কুলে শুধু সে সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাই একুশে ফেব্রুয়ারির সাথে পরিচিত, যে সব ক্লাসে একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ক রচনা মুখস্থ করানো (পড়ানো নয়) হয়!

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, তবে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন এই স্কুল থেকে একুশ এবং একুশের চেতনা সমূলে বিলুপ্ত হবে। সেদিন কোন সচেতন ব্যক্তি যদি এখানে একুশের চেতনা খুঁজতে চান, তবে নিঃসন্দেহে তঁকে সিরতের তরীক্ব রইসীতে (রাজপথে) নেমে চিৎকার করে গাইতে হবে- 'ও একুশ, তুমি কোথায়!'

১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০৫
সিরত, লিবিয়া।